## পরম পুরুষ ভৃগুরাম স্বামী

বীরভূম জেলার কেতুগ্রামের (প্রাচীন বহুলাপুর) সুপ্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের ভগবৎ প্রেমিক মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র মহাসাধক স্বামী ভৃগুরাম বিদ্যাবাগীশ। ইনি তিকু বা ত্রিবিক্রম নামেও পরিচিত ছিলেন। শৈশব হইতেই ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। অতি অল্প সময়ে সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। বীরভূম জেলার বহুলা গ্রামের আগমবাগীশ বংশের এক বৈদান্তিক পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি নানা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার নিকট *'তারা'* মন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া মাত্র ২০/২১ বৎসর বয়সে আহমদপুর কাটোয়া লাইনের চার মাইল দক্ষিণে কেতুগ্রামে এই মহাসাধক শক্তি সাধনায় নিমগ্ন হন। পূর্বে এস্থলে চন্দ্রকেতু নামে এক সামন্ত রাজা বাস করিতেন। তাঁহার নামানুসারেই এই স্থানের নাম বহুলাপুর হইতে কেতুগ্রাম হয়। এখানে ভগবতী সতী দেবীর বামহস্ত পড়িয়াছিল। —

শ্রীভৃগুরাম স্বামীর আরাধ্যা দেবী বড়মা বা বুড়া মা

''বহুলায়াং বামবাহুর্বহুথ্যা চ দেবতা
ভীরুকো ভৈরবস্তত্র সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়ক।।''

পাল রাজাদের সময়ে নির্মিত বহুলাপুরের (বর্তমান কেতুগ্রাম) বহু লক্ষ্মীমূর্তি কষ্টিপাথরে নির্মিত এবং উহার ভাস্কর্য্য অতি অপূর্ব। বহুলাক্ষী দেবীর ভৈরব ''ভীরুক'' ভূতনাথ নামে কেতুগ্রামের দক্ষিণ-পূর্বে শ্রীখণ্ড গ্রামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই বহুলাপীঠ সম্বন্ধে ''শিবচরিত'' গ্রন্থে বর্ণনা আছে। তাহাতে দেখা যায় যে রাঢ় দেশের অন্তর্গত ইন্দ্রাণীর নিকটবর্তী রাজ্য এই বহুলাপুর এবং বহুলাদেবীর নিকট হইতে অর্ধক্রোশ দূরে বকুলা নদীতীরে মরাঘাটে এক জাগ্রত পীঠস্থান অবস্থিত রহিয়াছে। এই পীঠস্থানের নিকটেই এক মহাশ্মশান। এই মহাপীঠেই সাধক ভৃগুরাম সাধনা করিবার সময় দৈবাদেশ পাইয়া বেলুনের (বর্তমানে বর্দ্ধমান জেলার বড়বেলুন) মহাশ্মশানে গমন করেন। এই বেলুনের মহাশ্মশানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন স্থাপন করিয়া বহুলাপুর হইতে আনীত এক

প্রস্তরমূর্তি ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া ভৃগুরাম স্বামী জরতী মূর্তির তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার আরাধ্যা দেবীর নাম মহানন্দা, বহুলাক্ষী, দেবী চামুণ্ডা, বড়মা বা বুড়া মা। কুব্জিকাতন্ত্রে মহানন্দার কাহিনী আছে। শিবচরিত গ্রন্থে বড়মা বা বুড়া মা নামকরণ হইয়াছে বহুলাক্ষী ও দেবী চামুণ্ডা।

বেলুনের গভীর জঙ্গলপূর্ণ মহাশ্মশানে মহাপুরুষ ভৃগুরাম স্বামী যে সময় সাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন, সেই সময় ডাকাত দল ঐ মহাশ্মশানে কালীপূজা করিয়া ডাকাতি করিতে বাহির হইত। ঐ ডাকাত দলে গণেশ চন্দ্র রায় নামক একজন ভগবৎ প্রেমিক অন্তর্ভুক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল। এক রাত্রে ভৃগুরাম স্বামী ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আছেন, এমন সময় ঐ ডাকাতদল তাঁহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে মহামায়ার প্রভাবে তাহাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। তাহারা মহাসাধকের সন্নিকটে পৌঁছিয়া আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া হঠাৎ যে যেভাবে ছিল সে সেই অবস্থায় অনড় হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। যথাসময়ে মহাসাধকের ধ্যান ভঙ্গ হইলে পরে তখন তিনি প্রকৃত অবস্থা অবগত হন। পরে মহাসাধকের কৃপায় উহারা সংজ্ঞা ফিরিয়া পাইলে তখন গণেশ রায় সাধকের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা চায়। করুণাবৎসল মহাসাধক ভৃগুরাম গণেশকে পরবর্তীকালে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং গণেশও মাতৃদর্শন লাভ করিয়া জীবনকে সার্থক করেন। এই শক্তিপীঠে ভৃগুরাম স্বামী প্রতি অমাবস্যা ও অষ্টমী তিথিতে এবং শনি ও মঙ্গলবারে বিশেষ পূজা করিতেন।

গণেশ রায়ের উল্লিখিত ঘটনা ঘটিবার পর চতুর্দিকে মহাসাধকের অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রচার হইয়া যায়। বড় বেলুনের রাজবংশের রাজা নারায়ণ চন্দ্র রায় বিল্লপত্তনের ভীষণ জঙ্গল কিছুটা পরিষ্কৃত করিয়া রাজবাড়ীর সংলগ্ন স্থানে কিছু লোকের বসতি স্থাপন করান। কিন্তু জঙ্গলের মহাশ্মশান অংশের কোনও পরিবর্তন হয় না। এইখানেই মহাসাধক ভৃগুরাম স্বামী গভীর জঙ্গলের মহাশ্মশানে ''তারা'' ''তারা'' বলিয়া বিকট চীৎকার করিতেন। এক কার্তিকেয় অমাবস্যার দিন তিনি কারণ দিয়া মৃত্তিকা সিক্ত করিয়া লইয়া এক হাত পরিমিত মাতৃমূর্তি নির্মাণ করিয়া তালপাতার তৈরী ছাউনির মধ্যে মূর্তি স্থাপন করিয়া সন্ধ্যার পর স্নানের নিমিত্ত বাহির হন। স্নানাদি সমাপনান্তে মহাশ্মশানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন, তালপাতার ছাউনি ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে এবং মৃন্ময়ী মূর্তি ভীষণাকার সুউচ্চ চিন্ময়ী মূর্তিতে রূপান্তরিত হইয়া দোলায়মান। ইহা দর্শনে শ্মশানবাসী, নির্ভীক, তেজস্বী, মহাসাধকের দেহ ভয়ে কম্পিত এবং বাক্‌শক্তি রহিত অবস্থায় ক্ষণকাল কাটিবার পর তিনি মূর্তির সম্মুখে অগ্রসর হইয়া করজোড়ে মহামায়ার স্তব আরম্ভ করিলেন। মহামায়া সাধককে জানাইয়া দিলেন যে তাঁহার ঐরূপ বৃহৎ মূর্তি গঠন করিয়া পূজা করিতে হইবে। মহাশ্মশানে ভৃগুরাম স্বামী শয়নে, স্বপনে, জাগরণে মা ছাড়া থাকেন না। মায়ের সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ। এক গভীর নিশীথে ভৃগুরাম স্বামী নিদ্রিত আছেন, এমতাবস্থায় ''বুড়া মা'' তাঁহার শিয়রে বসিয়া বলিতেছেন — ''ভৃগু তুই কি করবি?'' ভৃগুরাম উত্তর দিলেন, ''মা তুই আমার সব। তুই যা করাবি, আমি তাই করব।'' তখন রক্তবর্ণা, ললাটে চন্দ্রভূষণা, পট্টবস্ত্র পরিহিতা নানা অলঙ্কার শোভিতা, কোটিসূর্য্য চন্দ্রবৎ জ্যোতির্ময়ী বরাভয়করা দেবী আদ্যাশক্তি ভবানী ভৃগুরামকে আদেশ করিলেন — ''ভৃগু তুই বিয়ে কর। তোর অনেক বয়েস হয়েছে, তুই এ দেহ ত্যাগ করলে কে আমার নিত্যপূজা করবে? তোর বংশধরেরা আমার নিত্য পূজা করলে আমি তোর ঘরে বাঁধা থাকব। অমাবস্যার রাত্রে এক ব্রাহ্মণ কুমারী সর্পাঘাতে মারা গেলে তাকে এই মহাশ্মশানে আনবে, তার মুখে চিতাভস্ম দিলে সে বেঁচে উঠবে।'' এই বলিয়া মা অন্তর্ধান করিলেন।

রাজা নারায়ণ চন্দ্র রায়ের একমাত্র গুরুকন্যার সর্পদংশনে মৃত্যু হইলে অমাবস্যার রাত্রে মৃতদেহ মহাশ্মশানে আনা হয়। ভৃগুরাম স্বামী চিতাভস্ম মৃত ব্রাহ্মণ কুমারীর মুখে দিলেই উক্ত গুরুকন্যা নবজীবন লাভ করেন। পরে ভৃগুরাম স্বামী মায়ের নির্দেশে ৯৫ বৎসর বয়সে রাজার গুরুকন্যাকে বিবাহ করিয়া সংসারী সাজিলেন। এই সময় তিনি ''বুড়া গোঁসাই'' নামে অভিহিত হন। শেষ জীবনে তিনি একবার মাত্র নিরামিষ ভোজন করিতেন। ভৃগুরাম স্বামী সংসারী সাজিলেও তাঁহার সাধনা হইতে বিচ্যুত হন নাই। অত্যশ্রয়ী সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়া মাতৃপদ প্রাপ্ত হন।

ভৃগুরাম স্বামী অলৌকিক যৌগিক ক্ষমতা বলে একই সময়ে একাধিক স্থানে অবস্থান করিতে পারিতেন তিনি মহাশ্মশানে অবস্থানকালে ঐরূপ ক্ষমতাবলে পুরীতে বৈষ্ণব সাধক মহাত্মা অনন্তপুরী গোস্বামীর সহিত মিলিত হন। সংসারী ভৃগুরাম স্বামীর তিনটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তাঁহাদের ডাক নাম নেঙ্গুর, ভেঙ্গুর ও পীতাম্বর। নেঙ্গুরের

ভাল নাম পণ্ডিত শিবচরণ ন্যায়ালঙ্কার। তিনি ঢাকায় যাইয়া সংস্কৃত পাঠ গ্রহণ করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন ও মহাপণ্ডিত হন। ইনি শক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। দ্বিতীয় পুত্র ভেঙ্গুরের ভাল নাম পণ্ডিত শঙ্কর প্রসাদ বেদান্ত বাগীশ। ইনি বেদ বেদান্ত ও দর্শন শাস্ত্রের খ্যাতিমান পণ্ডিত ও বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তৃতীয়, পীতাম্বরের ভাল নাম পণ্ডিত গোবর্দ্ধন চূড়ামণি। ইনি সাধনায় বহু বিভূতির অধিকারী ছিলেন। তিনি বহু দেবদেবীর স্তুতি রচনা করিয়াছিলেন এবং ''মহাদেব'' নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এনার কোনও সন্তানাদি ছিল না।

সাধক ভৃগুরাম ১৩৫ বৎসর বয়সে তাঁহার বিশেষ অনুগত শিষ্য গণেশ রায় মহাশয়ের সাহায্যে ''গোঁসাই গড়িয়া'' নামক পুষ্করিণী খনন করান। ঐ পুষ্করিণী যেদিন প্রতিষ্ঠা করা হয় সেই দিন রাত্রে ভৃগুরাম স্বামীজী তাঁহার পুত্রগণকে ডাকিয়া বলিলেন, ''আগামীকাল অমাবস্যা, প্রাতে আমি এ দেহ ত্যাগ করিব। বাস্তবিক হইয়াছিলও তাই। পরদিন প্রাতে ভৃগুরাম স্বামী বুড়ামার নাম কীর্তন করিতে করিতে সমাধিস্থ হন। মহাসাধকের নশ্বর দেহ বড়মার মন্দিরের মধ্যে পঞ্চমুণ্ডীর আসনের পশ্চিম দিকে সমাধিস্থ করা হয়।

''স ধন্য পুরুষোলোকে স কৃতী পরমার্থবিৎ।
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সত্যসন্ধো যে ভবেদ্ ভুবি মানবঃ।।''

ইতি—মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্

*(''শক্তিপীঠের সাধক'' নামক গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত তথ্য)*

**সংকলন : শ্রীশ্রীমা সর্বাণী**